সাহায্য

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

গরিবপুরের হাট হপ্তায় দু'দিন। দুদিনই আসি।

গোপালনগরের বাজারে পানবিড়ি বিস্কুটের দোকান। রোজ দোকানে যা বিক্রি, হাটে এলে অনেক বেশি বিক্রি হয় তার চেয়ে। আশেপাশের ক'খানা গ্রামের হাটই করতে হয় এজন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ের গোপীনাথ বৈরাগী আছে গোপালনগরের আলি নিকিরি, মধু জেলে। কিন্তু ওরা গোপালনগর ইস্টিশান পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে, বাকিটা যেতে হবে আমাকে একলা। নিতান্ত ভীতু নই, তাই ওই বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারবো। আমি পান বিড়ি বিস্কুট বড় থলের মধ্যে পুরে বললাম—চলো। সন্দে হয়ে গেল যে—শীতও পড়েচে আজ বড্ড—

আলি নিকিরি বললে—রও গো রও। তবিল বেঁধে নিই—শীত পড়েচে বটে—

তারপর আমরা তিনজনে রেল রাস্তায় উঠলাম। রেললাইনের পাশে সরু পায়ে-চলার পথ। কিন্তু আমরা সবাই যাচ্ছি একখানা স্লিপার থেকে আর একখানা স্লিপারে পা দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। গরিবপুর ইস্টিশান ছাড়িয়ে লাইনের দু-ধারে মাঠ আর বন। নির্জন জায়গা, লোকজনের বসতি নেই। ছ'মাইল দূরে গোপালনগর ইস্টিশান। এ ছ'মাইলের মধ্যে লাইনের বাঁ পাশে কেবল একখানা চাষাগাঁ আছে মেহেরপুর, তার আধ মাইল পরেই গোপালনগর ইস্টিশন।

সুতরাং অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে হেঁটে এই অন্ধকারে। বেশ মজা লাগে তিনজনে গল্প করতে করতে যাচ্চি বলে।

আলি বললে—কত বিক্রি হল গো?

—সাত চাকা পাঁচ আনা।

—পানবিড়ি?

—বিস্কুটও আছে।

—আছে দু'একখানা? বড্ড খিদে পেয়েল—খ্যাতাম।

—না আলি দা। গুড়োগাঁড়া পড়ে আছে চিনি। সে আর তোমারে দেবো না।

গোপীনাথ বৈরাগী ঘুন্‌সি চিরুনি কাঠের মালা বিক্রি করে। সে বললে—হাট আর সে জুতের নেই বামুন দা। এই গরিবপুরের হাটে আগে আগে পাঁচ টাকার কম হাট থেকে ফিরতাম না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েচে দুই-তিন—আজ ন'সিকে। এতে মুনফা কি পাই আর পেট চালাই কি দিয়ে? সাড়ে তিন টাকা সরষে তেলের সের। পয়সা
লেট্‌চে আলি ভাই—

আলি বললে—কি আর লোট্‌লাম? মনসুর বনগাঁর বাজারে বসে, একডালা খয়রা আর একডালা পুবে চিংড়ি—রোজ সতেরো টাকা আঠারো টাকা মুনফা—আমার সেই জায়গায় সাত-আট—বড় জোর নয়।

—উঃ রে মুনফা!

—বড় হল?

—আমরা তো ধারণা কত্তি পারিনে—

—পারবা কি করে? ঘুন্‌সি কাঠের মালা ক'জন লোকে কেনবে? ও না হলিও লোকের চলে যাবে। কিন্তু মাছ না খেলি মুখে ভাত ওঠাবে কি দিয়ে সেটা বোঝো। এই শীতি মাছ না খেলে মানুষ বাঁচে।

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম—চুপ চুপ, ওই শোনো—

সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। চারিপাশে। সামনে একটা রেলের ছোট সাঁকো। তার দুদিকে জলাভূমি, জলার ধারে জঙ্গল, বেজায় ঘন। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটু দূরে ফেউ ডাকচে।ক'দিন ধরে আমাদের এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব হয়েচে। প্রায়ই এ-গ্রাম ও-গ্রামের গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। সামনে পড়লে মানুষকে কি আর ছাড়ে?

আলি সভয়ে বলল—কোথায়?

—রেলের পুলের ধারে জঙ্গলে—

—দাঁড়াও সব।

গোপেশ্বর এগিয়ে এসে বললে—চলো চলো, ও কিছু নয়—এতগুলো লোককে বাঘ ধরচে না—চলো—

বাঘের জলা পার হয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। মধু জেলে ছেলেমানুষ, তার ভয় হয়েছে!সে বললে—রায় কাকাবাবু, মোরে মাঝখানে করে ন্যাও—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—নে আচ্‌কান! বিশ বছরের ধাড়ির ভয় দ্যাখো—শীতকালে ফি বছর বাঘ আসে, জানো না ?

মধু বললে—না, পায়ে পড়ি মোরে এট্টু মাঝখানে ন্যান্—মোর গা ডোল দিয়ে উঠেচে—এই দেখুন হয় না হয়—

—এত ভয় তোর? হাট কত্তি আসিস কেন? মার আঁচল ধরে বসে থাক গে!

কথাটা বললে আলি নিকিরি।

মধুকে মাঝেই নেওয়া হল সবার কথায়।

মধুর ভয় তখনো যায়নি। বললে—রাত্তিরি ছ'টা পয়সা বাঁচাবার জন্যি এল—গাড়িতি না গিয়ে হেঁটে অ্যালেন সবাই, কিন্তু ভালো কাজ করলেন না। আজ মঙ্গলবার অমাবস্যে—সেবার মুই আলেয়া ভূত দেখেলাম চাতরাবাগির বিলি—

আলি বললে—বিলির জলে?

—না গো। বিলির জলের ধারে। জ্বলচে নিবচে জ্বলচে নিবচে—

গোপেশ্বর বললে—যাকগে। রাত্তিরকালে ওই সব—রাম, রাম, রাম, রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেচি। এ দলের মধ্যে সাহসী আলি নিকিরি, তারপরেই আমি; ভূতটুতের ধার ধারিনে। মধু ছেলেমানুষ, ওর না হয় ভয় হওয়া সম্ভব—কিন্তু গোপেশ্বর বোষ্টম আধবুড়ো লোক, ওরও ভয়! হাসি পায় বৈকি।

এর পরে নানারকম ভূতের গল্প উঠলো। জলার মধ্যে নক্ষত্র জ্বলচে, কাশবনে শেয়াল ডাকচে; শ্যামলতার সাদা ফুল অন্ধকারে দেখা যাচ্চে ঝোপে ঝোপে, মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্চে। ঝিঁঝি ডাকচে পায়ের তলায় ঘাসবনে।

আলি নিকিরি মাছের ব্যবসার গল্প করচে। এবার ও পাঁচপোতার বিল জমা নেবে, আশিখানা কোমড়ে আছে। এক এক কোমড়ে দু মণ মাছ হবে। গোপেশ্বর জিগ্যেস করলে—কোমড়ে যে পেতেছিল, সে মাছ তোলেনি তা থেকে?

আলি বললে—কি করে ধরতি পারবে? অত জলে আর কচুরিপানার দামে বোঝাই বিলির মধ্যি মাছ। অত সোজা না মাছ ধরা!

গোপালনগর ইস্টিশান এল, ওরা রেলের বেড়া টপকে অন্য রাস্তায় চলে গেল। আমি এবার একা। ইস্টিশন ছাড়িয়ে দুধারে জঙ্গল বড্ড ঘন। আমার ভয়-ডর নেই, এত বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একাই যাচ্চি, নানারকম অপদেবতার গল্প শুনেও। রায়পুরের রাস্তাটা যেখানে রেললাইনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেখানটাতে জঙ্গল বড্ড ঘন।

হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ওটা কি জঙ্গলের মধ্যে সাদা মতো? নড়চে? একটা কুস্বরও কানে গেল? সর্বনাশ! এখন উপায়? আমার গলা কাঠ হয়ে গেল। হাত-পা যেন জমে হিম বরফ হয়ে গিয়েচে।

কানে গেল কে যেন ক্ষীণ দুর্বল স্বরে কি বলচে? আমার শরীর দিয়ে যেন ঘাম বেরিয়ে গেল। এ তো মানুষের গলা! ভূতে শুনেচি নাকিসুরে কথা কয়।

ঝোপের দিকে এগিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখি একটা কালোমতো বুড়ো লোক ময়লা নেকড়া-চোকড়া জড়িয়ে বসে আছে একটা কুঁচঝোপের নিচে। ভয়ের সুরে চিঁ চিঁ করে বললে—মোরে খাতি দাও। না খেয়ে মরে গেলাম।

—এখানে কি করে এলে? বাড়ি কোথায়?

—মোরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েল গোপালনগর ইস্টিশানে। হাঁটতি হাঁটতি এয়েলাম। না খেয়ে মলাম। এটু জল দ্যাও। বাঁচবো না—মোরে বাঁচাও—তুমি মোর ধম্মের বাপ—

—গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলে কেন? টিকিট করোনি?

—গায়ে 'মায়ের দয়া' হয়েছে। হাঁটতি পারিনে। সারা অঙ্গে ব্যথা। মোরে বাঁচাও—

অন্ধকারে ভালো দেখতে পাইনে। তাই তো, ওর সারা গায়ে বসন্ত বেরিয়েচে! নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই! আর এই শীতে, এই নির্জন রেলরাস্তার ঝোপের মধ্যে... আমার সারা গা শিউরে উঠলো। কিন্তু কি উপায় করি আমি একা?

—বিস্কুট খাবা?

আমার থলেতে বিস্কুট আছে। তখন আলি নিকিরিকে মিথ্যে কথা বলেছি। রোজ রোজ বিনি পয়সায় পরকে বিস্কুট খাওয়াতে গেলে চলে না। ও কি কখনো বিনি পয়সায় মাছ খাওয়ায় আমাকে? থলেতে খান কুড়ি বিস্কুট ছিল, থলে ঝেড়ে ওর নেকড়াতে ফেলে দিলাম দূর থেকে। একটা বিড়ি ও একটা দেশলায়ের খোলে দুটি মাত্র কাঠি পুরে এর নেকড়াতে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম–খাও—

বিড়ি ধরাবার সময় দেশালাইয়ের কাঠি ও অতি কষ্টে জ্বাললে। ওর হাত কাঁপচে। দেশালাইয়ের কাঠির আগুনে দেখলাম, ওর মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্ছে বসন্তের ঘায়ে! বলতে নেই, মা শীতলা রক্ষে করুন।

—এটু জল দ্যাও মোরে—জলতেষ্টায় মলাম—

মুশকিল! জল পাই কোথায়? জলের পাত্র বা কোথায় এখানে? রাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধক্রোশ দূর—সেখান থেকে জল আনতে হবে।

যদি না আনি ও তেষ্টায় মরে যাবে। চলে গেলাম সেই অন্ধকারের মধ্যে রাইপুর। কুমোর বাড়ি থেকে একটা কলসি কিনে পাঁচু তরফদারের টিউব-কল থেকে জল পুরে আবার নিয়ে আসি রেলরাস্তার ধারে। ওর কাছে কলসি এনে দেখি সে ক্ষীণ সুরে কাতরাচ্চে, জল খাবার জন্যে কিছু আনা হয়নি, ভুল হয়ে গিয়েছে। কলসিটা ওর পাশে বসিয়ে বললাম— কলসির কানায় হাত দিয়ে জল খাও।

থলে থেকে আরো গোটাকতক বিড়ি বার করে একটা দেশালাই সমেত কলসির পাশে রেখে আমি যখন যেতে উদ্যত হয়েছি, লোকটা বললে— যাচ্চ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কনে যাবা?

—বাড়ি যাবো, আর কোথায় যাবো?

—মুই দুটো ভাত খাবো—

আমি রাগ করে বললাম—কোথায় পাবো ভাত? রাত ন'টার গাড়ি চলে গিয়েচে, বাঘের ভয়, আমি বাড়ি যাবো কি করে? এখনো এককোশ পথ, আমি চললাম—

—শোনো, ওগো শোনো মোর কাছে বসবা না?

—আমার কাজকর্ম নেই তো, বসি তোমার কাছে এখন! কি ঝকমারি যে আজ আমি করিচি! এর পর থেকে আর কোন্ শালা—

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললে— মোর বড্ড শীত নেগেচে—

বিবেচনা করে দেখলাম তা লাগতে পারে। আমারই হাড় কাঁপিয়ে দিচ্চে কনকনে উত্তুরে কলাই-ওড়ানো হাওয়ায়। আগুন করে দিই শুকননা ডালপালা দিয়ে ওর কাছ থেকে একটু দূরে। এবার চলে যাবো, ওর কোনো কথা এবার শুনবো না। ও কিন্তু আবার গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললে— মোর কাছে একটু বসবা না?

ওর চোখে অসহায় মিনতি।

না, বাড়ি যেতে পারলাম না।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই, সেই হিম-পড়া কনকন রাতে বাড়ি ফেরার কথা ভুলেই গেলাম। বসে রইলাম সারা রাত সেই আগুনের কাছে। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোররাতেই লোকটা মারা গিয়েছিল, তা আমি জানিনে—তখনো আমি আগুনের পাশে ঘুমুচ্চি।